মাযহাব অনুসরণ করা এবং না করার মাঝামাঝি

মূলঃ ড. ওয়ালিদ আল মানিসি

ফিকহের জ্ঞানার্জনের জন্যে দুটো রাস্তা রয়েছে-

প্রথম পন্থা হচ্ছে সার্বজনীন মাযহাবগুলোর মতন[1] অধ্যয়ন করার মাধ্যমে। এটাকে ফিকহি/ফিকাহবিদদের পন্থা বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ, হাম্বলি মাযহাব অনুসরণকারী কেউ প্রাথমিক পর্যায়ে ইবনে কুদামাহ [র] রচিত *আল-উমদাহ* অথবা ইবনে বালবান [র] রচিত *আখসার-আল-মুখতাসারাত* পড়বে। দ্বিতীয় ধাপে, সে ইমাম হাজ্জাউই-র [র] *যাদ-উল-মুস্তাকানি* অথবা মা'রি-আল-কারমির *দলিল আত তলিব* পড়বে। তৃতীয় ধাপে গিয়ে সে ইবনে আন-নাযযার [র]-র *মুনতাহা-আল-ইরাদাত* অথবা মুসা-আল-হাজ্জাউই [র]-র *আল ইকনা* পড়বে। চতুর্থ ধাপে গিয়ে সে ইবনে কুদামাহ [র]-র *আল কাফি* অথবা আল-মজদ আব্দুস সালাম ইবনে তাইমিয়া [র]-র[2] *আল মুহাররার* পড়বে। এভাবে, প্রত্যেকটি মাযহাবের শিক্ষার্থীরাই সেই মাযহাবের আলিমদের প্রতিষ্ঠিত পন্থায় একেকটি ধাপ পেরিয়ে এগোতে থাকবে।

দ্বিতীয় রাস্তা হচ্ছে, হাদিসের বইয়ের মধ্য হতে ফিকহ অধ্যয়ন। এটাকে বলা যেতে পারে 'হাদিসবিশারদগণের পন্থা'। ছাত্ররা হাদিসের সেই বইগুলো পড়বে যেগুলোতে হাদিসগুলো ফিকহি হুকুম-আহকাম অনুযায়ী বিন্যস্ত রয়েছে, যেমন আল-মাকদিসির *উমাদাত-উল-আহকাম*; এরপর ইবনে হাজর [র] এর *বুলুগুল মারাম*, এরপর ইবনে আল হাদির *আল-মুহাররার*, এরপর [ইবনে তাইমিয়ার] দাদা, আব্দুস সালাম ইবনে তাইমিয়ার [র] *আল মুনতাকা*। এরপর *সহিহাইনের* [বুখারি এবং মুসলিম] মত হাদিসের সংকলন এবং চার *আস-সুনান*[3], ব্যাখ্যাসহ।

---

[1] মাযহাবগুলোর ফিকহি মতন, যেমন, হাম্বলি মাযহাবের বিদায়াতুল আবিদ কিংবা হানাফি মাযহাবের মুখতাসার আল কুদুরি। এগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে সংক্ষিপ্ত ভাষায় বিভিন্ন বিষয় যেমন, তাহারাহ, সালাত, সাওম ইত্যাদির আইন-কানুন বা মাস'আলা পর্যায়ক্রমে সন্নিবেশিত থাকে। এসব মতন এমনভাবে রচিত যাতে সেটা কথায় অল্প হয় এবং মুখস্ত করা তুলনামূলক সহজ হয় এবং উস্তাদ ছাড়া নিজে নিজে অধ্যয়ন করলে সাধারণত ভুল হবার অনেক সম্ভাবনা থাকে। প্রাথমিক মতনগুলোয় দলিল থাকে না, এবং পরবর্তীতে আলিমরা এই মতনগুলোর শারহ বা ব্যাখ্যা লিখে থাকেন যেখানে দলিল এবং কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত নিয়ে আলোচনা থাকে। কোন মাযহাবের ফিকহের সিলেবাসে প্রথমে ছোটখাট মতন দিয়ে শুরু করা হয়, এরপর আস্তে আস্তে বড় মতনগুলো আসতে থাকে যেগুলো বেশি ইস্যু কভার করে। এভাবে মাযহাব অনুসারে ফিকহ অধ্যয়ন এগোতে থাকে।

[2] বিখ্যাত ইবনে তাইমিয়ার [র] দাদা।

[3] সুনানে আবু দাউদ, সুনান আত-তিরমিযি, সুনান আন—নাসাঈ এবং সুনান ইবনে মাজাহ।

প্রথম পন্থার সুবিধা হচ্ছে এটি ফকিহকে আইন-আহকামের ব্যাপারে পারদর্শী এবং প্রস্তুত করে তোলে। আইনগত/ফিকহি ফুরুয়ি [শাখাগত] বিষয়গুলোর ভাণ্ডার, ফকিহদের দুর্বোধ্য পরিভাষাগুলোর সাথে পরিচিত হবার পাশাপাশি নিজের মাযহাবের বইগুলোতে নিজে গবেষণা করতে সক্ষম হতে পারে। এসবই- আহলুল-ইলমদের[4] সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারো ন্যায় ফিকহি বিষয়সমূহ বুঝতে পারা এবং আয়ত্ত করার জন্যে যোগ্য হয়ে ওঠার মাধ্যমে।

প্রথম পন্থার অসুবিধা হচ্ছে, এই পথের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন ব্যক্তির হাদিস-সুন্নাহর ব্যাপারে জ্ঞান এবং দলিল প্রতিষ্ঠিত করার পন্থার ব্যাপারে কম জ্ঞান রাখে। তাছাড়া, এরুপ কেউ আলিমদের ব্যাপারে চরমপন্থী হয়ে উঠতে পারে, ক্রিটিক্যাল চিন্তাভাবনায় স্থবির হয়ে যেতে পারে এবং ফিকহি ইস্যুগুলো থেকে কি উদ্ভুত হয়- সে ব্যাপারে গবেষণা করার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয় পথের সুবিধা হচ্ছে, এখানে পক্ষপাতিত্ব এবং কোন একটি মত নিরেটভাবে ধরে রাখার ব্যাপারটি কম, হাদিসের প্রতি শ্রদ্ধা, হাদিসের মতন এবং রাবির দ্বারা হাদিসের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা অধ্যয়ন করার মাধ্যমে বিশদ জ্ঞান-বুঝ হওয়া, আকিদা, আদব-কায়দা, সচ্চরিত্র, রাসুলের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সিরাহ এবং অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন ফায়দার ব্যাপারে জ্ঞান-অর্জন হওয়া। অসুবিধা হচ্ছে ফিকহে প্রমাণাদি শুধুমাত্র হাদিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিভিন্ন আহকাম-মাস'আলার ক্ষেত্রে দলিলের মধ্যে রয়েছে কুর'আনের আয়াত, ইজমা, কিয়াস, মদিনার মানুষের দৃষ্টান্ত, সাহাবীদের [রা] দৃষ্টান্ত, ইসতিসহাব[5] বা ইসতিসহান এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ। এভাবে, ছাত্ররা প্রত্যেকটি বিষয়ে/ক্ষেত্রে ফিকহের অনেক আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহ বাদ দিয়ে যায়, কেননা সেগুলো হাদিস থেকে সরাসরি আহরণ করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, যাদুল মুস্তাকানি[6]- যেটি একটি সংক্ষেপিত মতন- প্রকাশ্যভাবে দু'হাজার চারশ ফিকহি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; আর পরোক্ষভাবে প্রকাশ করা বা উদ্ভুত ইস্যুসমূহ গণনা করলে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ছয় হাজার।

যেহেতু আহকাম-সংক্রান্ত হাদিসের বইগুলোতে ফিকহি বিষয়সমূহের সংখ্যা, উদ্ভুত বিষয়গুলোর চারভাগের এক ভাগ-ও হয় না, তাই মাঝেমধ্যে এটি শিক্ষার্থীকে শেখার শুরুতে প্রতারিত হতে ধাবিত করে এবং সে-ছাত্র ফকিহদের সাথে অনধিকার চর্চা করা, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়া ইজতিহাদ এবং দুটো ভিন্ন ফিকহি

---

[4] ইলম মানে জ্ঞান। আহলুল ইলমের শাব্দিক অর্থ হয় "জ্ঞানের মানুষ", অর্থাৎ যার মধ্যে ইলম বিদ্যমান রয়েছে।

[5] ইসতিসহান বলতে বোঝায় কোন বিষয়ে বিধানের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য বিষয়ের বিধান গ্রহণ না করে বিশেষ বিবেচনায় ভিন্ন বিধান গ্রহণ করা [উসুল আল ফিকহ, ড. মানজুরে ইলাহি]। বিস্তারিত দেখুন, ইসলামী আইনের মূলনীতি-ড. হাশিম কামালি।

[6] হাম্বলি মাযহাবের অন্যতম সুপরিচিত মতন। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে যাদুল মুস্তাকানি এবং বুলুগুল মারাম কারও বিচারক হবার জন্যে যথেষ্ট। এর উপর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ আলিম শাইখ ইবনে উসাইমিনের [র]-ও শারহ [শারহ আল মুমতি] রয়েছে।

মতের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু করে। তাছাড়া, একটি বিষয় শেষ করার আগেই আরেকটিতে পা বাড়ানোর কারণে ছাত্ররা বিচ্যুত হয়ে যাবে। এছাড়াও, একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা টপিক কতগুলো সাব-টপিক বা শাখায় বিভক্ত হতে পারে, এবং এই আলোচনা কয়েকটি হাদিসে পুনরাবৃত্তি হতে পারে, কিন্তু হয়ত সে হাদিসগুলো একসাথে নেই।

এসকল কারণে, উপদেশ হচ্ছে দুটো পন্থা একত্রে ও সমন্বয় করা, এবং চার মাযহাবের একটির মাধ্যমে ফিকহ অধ্যয়ন করা- ঐ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা গড়ে তোলা পন্থায় এবং সাথে সাথে হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত আয়াতের কোনো বই এবং হাদিসের কোনো বই পড়া। আর কতই উত্তম না হবে, যদি উভয়ের লেখকই একই মাযহাবের হয়, যাতে ফিকহি ইস্যুতে পরস্পর বিরোধী ফিকহি প্রাধান্যর কারণে কেউ বিচ্যুত হয়ে না যায়।

মাযহাব হচ্ছে যখন কোনো তলিবুল ইলম চার মাযহাবের একটিতে থাকে এবং সেই মাযহাবের আলিমদের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসারে পড়াশোনায় এগোতে থাকে। সুতরাং, যারা কোন মাযহাবে ফিকহ শিখে, তাঁরা সাধারণত প্রথম পন্থায় নিজেদের আবদ্ধ রাখে; কিন্তু তাদের মধ্যে সফল হচ্ছে তাঁরা যারা দুটো পন্থাকে একত্রে সমন্বয় করে। যারা কোন নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের বিরোধিতার প্রবক্তা, তাদের বেশিরভাগই দ্বিতীয় রাস্তায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে।

কোন মাযহাবে থাকা উম্মাহর ফকিহদের পন্থা। এভাবে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া [র] , ইবনে কায়্যিম [র] এবং আব্দুল ওয়াহাব [র] ছিলেন হানাবিলাহ। ইবনে কাসির [র] এবং আয-যাহাবি [র] ছিলেন শাফেয়ী। ইমাম তাহাবি ছিলেন হানাফি; ইবনে আব্দুল বার [র] ছিলেন মালেকি। মাযহাব প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ব্যাপারটি এরুপ হয়ে আসছে, এর আগে সাহাবীদের [র] মধ্যে ফকিহ ছিলেন। তাদের প্রত্যেকেরই ছাত্র ছিল যারা মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ করে[7], যেটি পরে গিয়ে পরবর্তী মাযহাবগুলোয় পরিণত হয়েছে।

কোন ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা এবং একাগ্রতা যে পর্যায়েই পৌঁছাক না কেন, সে হাদিস, ভাষা, উসুল, কাওয়াইদ ইত্যাদি দ্বারা বিস্তর প্রমাণাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে সকল বিষয়ে মুজতাহিদ হতে পারবে না। তাই এটি অনিবার্য যে তাকে বেশিরভাগ ফিকহি ইস্যুতে তাকলিদ করতে হবে। কোন নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ করা তাকে নিমগ্ন রাখবে এবং এটা তাঁর জন্যে উত্তম, যখন বিভিন্ন দলিলগুলো একই ওজনের এবং কোন নির্দিষ্ট মতের অন্য মতের উপর গুরুত্ব বিদ্যমান নয়- তাই এরুপ ক্ষেত্রে সে নিজের ইমামকেই অনুসরণ করল।

---

[7] সাহাবীদের মধ্যে ফকিহ যেমন- আদবুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রা]। উনি ছিলেন কুফাবাসি, তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন তাবিয়িগন শিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা [র]-ও একই এলাকার এবং এই কারণে ইমাম আবু হানিফার ফিকহে ইবনে মাসউদ [রা]-র প্রভাব লক্ষণীয়।

যেহেতু সাম্প্রতিক সময়ে যারা কোন নির্দিষ্ট মাযহাবে থাকা বা অনুসরণ করার বিরোধিতা করে, তাঁরা শেষমেশ ইবনে বায, ইবনে উসাইমিন বা ইমাম আলবানি রহিমাহুল্লাহর অনুসরণ [বা তাকলিদ] করে বসে, তাঁরা চার আইম্মাহ এর অনুসরণ থেকে দৌড়ে পালিয়ে তাদের থেকে [জ্ঞানে] কম কারও অনুসরণ করে বসেন।

যারা কোন নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের বিরোধিতা করে, তাদের এই ব্যাধি তাদের বেশিরভাগ অনুসারীকেই বিভিন্ন অস্বাভাবিক/বিচ্ছিন্ন মত তৈরির দিকে ধাবিত করে। এগুলো হচ্ছে এমন ধরণের মত, যেগুলো কেবল মাত্র একজন ফকিহ পোষণ করেছেন, সেটা হতে পারে সালাফদের কোন ফকিহ, অথবা চার মাযহাবের কেউ।

যতক্ষণ যারা চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণ করে, তাঁরা তাদের মতকে নিজের মাযহাবের নির্ভরযোগ্য/মুতামাদের উপর ভিত্তি করে, তাহলে তাদের মাযহাবের মুতামাদ বা নির্ভরযোগ্য মত কখনো কোনো অস্বাভাবিক/বিচ্ছিন্ন মত হতে পারে না, কেননা প্রত্যেকটি মাযহাব শুধুমাত্র তাদের ইমামের [প্রতিনিধিত্ব] করে না, বরং তা শতাব্দি পর শতাব্দি ধরে দশ হাজার ফকিহ-বিশিষ্ট একটি মাযহাবের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা সেই মতগুলোর উপর নির্ভর করেছেন এবং সেগুলোকে সবচেয়ে শক্তিশালী মনে করেছেন।

আর আল্লাহ্‌র মাধ্যমেই সফলতা।

লেখক পরিচিতিঃ শাইখ ড. ওয়ালিদ আল মানিসি আলেক্সান্দ্রিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে আরবি ভাষার উপর স্নাতক করেছেন। এরপর তিনি সৌদি আরবে বিভিন্ন স্বনামধন্য আলিমের নিকট অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বিন বায, ইবনে উসাইমিন, ইবনে জিবরীন। তিনি ড. শাইখ সালেহ আশ শাইখ এবং সৌদির ফতওয়ার স্থায়ী কমিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান শাইখ ড. আব্দুর রাযযাক আল আফিফি হতে দুটো রিকমেনডেশন লেটার পেয়েছেন। তিনি আমেরিকা ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে ফিকহে মাস্টার্স এবং গ্র্যাজুয়েট থিওলজিক্যাল ফাউনডেশন থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তিনি আমেরিকার ফতওয়া কমিটি আমজার স্থায়ী সদস্য, আমেরিকান ওপেন ইউনিভার্সিটির এডুকেশনাল কমিটির সদস্য এবং ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটার প্রেসিডেন্ট।